সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা এবং জরুরী জ্ঞাতব্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

যে তিনটি কারণ আমাকে বইটিকে এ পদ্ধতিতে ও বিন্যাসে সাজাতে উদ্বুদ্ধ করেছে

প্রথমত: পুরাতন ফিক্বহ শাস্ত্রগুলোর কিছু নেতিবাচক মনোভাব। সেটা গঠনগত দিক থেকে হতে পারে কিংবা বিষয়বস্তুগত দিক থেকে হতে পারে:[1]

ক। গঠনগত, বিন্যাসগত ও অধ্যায়গত দিকগুলো হলো: এ সমস্ত কিতাবের মধ্যে কিছু কিতাবের বিষয়বস্তুগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, একটি বিষয় অন্যটির মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে কাঙিক্ষত মাসআলাটি উদ্ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি বিশেষজ্ঞদের কাছেও এটা দুষ্কর হয়ে যায়। বিশেষ করে এ সমস্ত কিতাবে বিষয়ভিত্তিক কোন সূচিপত্র উল্লেখ করা হয় নি, যা উল্লেখ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষকদের কাছে সহজ সাধ্য হত।

আরেকটি হলো: পদ্ধতিগত দিক। যদিও এ সমস্ত গ্রন্থের পদ্ধতি ও রীতিগুলো তৎকালীন যুগের জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে তা বুঝা অনেক কঠিন। সংক্ষপ্ত ইবারত ও দীর্ঘ কথাকে স্বল্প কথার মাধ্যমে সংক্ষেপ করণের রীতি এ সব গ্রন্থে লক্ষণীয়। ফলে তা দুর্বোধ্যতা ও দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায়। এ ত্রুটিগুলো মতন তথা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় যা ব্যাপকভাবে পরবর্তী মনীষীগণের মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে। আর এগুলোই পাঠক ও ফিক্বহ বিশেষজ্ঞদের নিকট উত্তম গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

এ গ্রন্থগুলোর আরেকটি দিক হলো: এগুলোতে ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করে এমন পরিভাষাগত বাক্যের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য সে সময়ের মানুষ ছাড়া আর অন্য কেউ বুঝে না।

খ। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে যে নেতিবাচক দিক রয়েছে তা হলো: এ গ্রন্থগুলোর কিছু কিছু গ্রন্থ সমসাময়িক যুগের বিশেষ প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির আলোকে লেখা হয়েছে। যা শুধু সে যুগে উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে নতুন আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন এ কিতাবগুলোর কিছু কিতাব (বিশেষ করে পরবর্তী যুগে) মাযহাব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে, যেখানে কোন উপযুক্ত দলীল পেশ করা হয় নি এবং মাসআলাগুলোকে একটি অপরটির সাথে তুলনা করা হয় নি অথবা প্রাধান্যও দেয়া হয় নি।

তদুপরি, অধিকাংশ মাযহাবী গ্রন্থগুলো মাযহাব প্রীতির রোগে আক্রান্ত হয়েছে যা ক্রোধের সৃষ্টি করে। এ সব গ্রন্থে সাধারণত মাযহাবকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। হয়তো বা এ স্বজনপ্রীতিটা ইমামের কোন বক্তব্যের কারণেই অথবা ইমামের অনুসারী ও ছাত্রের বাড়াবাড়ীর কারণেই হয়েছে। কিংবা সে মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পছন্দনীয় বিষয়ের কারণেই হয়েছে অথবা এ সমস্ত মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থের কারণে হয়েছে। এছাড়াও এসব গ্রন্থে অধিকহারে জাল-যঈফ হাদীসের ছড়া-ছড়ি হয়েছে। এসব দুর্বলতার দিকে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয় নি।

দ্বিতীয়ত: আধুনিক ফিক্বহ শাস্ত্রে অনেক নেতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়:

বর্তমান যুগের গ্রন্থগুলো যদিও উত্তম বিন্যাসে বিন্যাসিত ও যুগোপযোগী, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের কাছে খুবই প্রিয় এবং যদিও এ সব গ্রন্থে মাযহাব প্রীতির প্রভাব পড়ে নি, তবুও এ সব গ্রন্থে অসংখ্য নেতিবাচক বিষয় মিশ্রিত হয়ে আছে। বরং এ সব নেতিবাচক দিকগুলো কখনও অনেক ভয়াবহ ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এ নেতিবাচক দিকগুলো বিষয়বস্তু সংক্রান্ত এবং এমন ফলাফল সংক্রান্ত যা বিশেষভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন। এগুলো কখনও নতুন মাসআলার এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই নেতিবাচক দিকগুলো হলো:

ক। এ সব গ্রন্থে গবেষণাগত দুর্বলতা লক্ষ করা যায় এবং এগুলোতে পূর্ববর্তী ফিক্বহ ও হাদীস গ্রন্থ হতে রেফারেন্স গ্রহণ করে কোন গবেষণা করা হয় নি। যা মূলতঃ গবেষণা, ফাৎওয়া ও লেখনীর ক্ষেত্রে পথ চলার জন্য মূল হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলে আমরা দেখি যে, যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সে বিষয়ে কেউ আবার মতভেদ করেছে। অথবা এমন মতামতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে যা বিরল, পরিত্যক্ত ও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিংবা সে তার মনমতো কিছু মতামতের ক্ষেত্রে রাফেজী ও তার অনুরূপ ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের ফিক্বহ শাস্ত্রে বিচরণ করেছে। আর এটাকে সে মুসলমানদের কাছে ইসলামী ফিক্বহ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছে এবং বুঝাতে চেয়েছে যে, এটা মুসলমান বিদ্বানদের অভিমত!![2]

খ। এ গ্রন্থগুলোর কিছু গ্রন্থ বিদ্বানদের মতামতে ভরপুর। এ মতামতগুলোর ক্ষেত্রে কোন প্রকার দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষপ করা হয় নি এবং একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্যও দেয়া হয় নি। ফলে গবেষক ও পাঠকগণ এ ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এমনকি কিছু কিছু গ্রন্থের লেখক এ সমস্ত মতামতের যে কোন একটি অভিমতকে গ্রহণ করার স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ যুক্তি দেখিয়ে যে, এই মতামতগুলো পূর্ববর্তী কোন কোন বিদ্বানের বক্তব্য।[3]

গ। এ সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থে দলীলের বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি এবং প্রাধান্যও দেয়া হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেও তা বিদ্বানদের নীতিমালার আলোকে হয় নি।

ঘ। এসব গ্রন্থের কিছু গ্রন্থকে ফিক্বহী গবেষণা মূলক নীতির আলোকে রচনা করা প্রয়োজন। কেননা কিছু কিছু গ্রন্থ বক্তৃতাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে জ্ঞানের পরশ লক্ষ করা যায় না।

ঙ। কখনও আবার এ সব গ্রন্থ ইসলামের শত্রুদের আরোপিত মতামত ও সংশয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং কিছু কিছু বিধান যেমন: শামিত্মর বিধান, যুদ্ধের বিধান, কর সংক্রান্ত বিধান, আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত বিধান, বিধর্মী ও মুশরিকদের সাথে আদান-প্রদানের বিধান, বিচার-ফায়সালাগত বিধান, দাসত্বের বিধান, বহু বিবাহের বিধান প্রভৃতি বিধানসমূহ দুর্বল কথার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। কেননা সে এক্ষেত্রে প্রতিহত করার স্থানে অবস্থান করেছে। যার ফলে তার মধ্যে ইসলামকে দোষ মুক্ত করার আগ্রহ থাকার কারণে কিছু প্রতিষ্ঠিত বিধানকে বাতিল করেছে এবং কিছু দুর্বল মতামতকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।[4]

চ। যেমনটি এ গ্রন্থগুলো প্রভাবিত হয়েছে প্রভুর হিদায়াত ও নাবীর সুন্নাত হতে বিভ্রান্ত উম্মতের কর্মকা- দ্বারা। ফলে তা মানুষের জন্য ওযর-আপত্তি ও অযৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। যা নিষিদ্ধ ও হারাম কাজগুলোকে সহজ করে দিয়েছে। বাসত্মবতার চাপ সৃষ্টি করে তা মানুষের উপর অবধারিত করে দিয়েছে এবং ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে স্পষ্ট দলীলগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং সহীহ আসারগুলোকে যঈফ

(দুর্বল) বানিয়ে ফেলেছে।[5]

ছ। আধুনিক ফিক্বহ শাস্ত্রগুলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে তারা ওযূহাত দেখিয়েছে যে, এ সব বিষয়গুলো পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ আলোচনা করেননি। বর্তমান যুগে এর সাথে অনেক ঘটনা জড়িত এবং এসব বিষয়ের সাথে মানুষের অনেক প্রয়োজন সম্পৃক্ত আছে, যার ব্যাপারে ইসলামের কোন সঠিক বিধান পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এ সব বিষয়ের সমাধান দিতে গিয়ে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রণ করে ফেলেছে। আমরা যদি জীবন বীমা, আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম প্রজননসহ আরও অন্যান্য বিষয়াবলির দিকে লক্ষ করি, তাহলে অনেক আশ্চর্য বিষয় খুঁজে পাব।[6]

এ ছাড়াও আধুনিক যুগের অধিকাংশ গ্রন্থগুলো গবেষণা মূলক হওয়া সত্ত্বেও তা একই বিষয়ের উপর লিখিত। যদিও পরিপূর্ণ ফিক্বহ গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তা পূর্বোলেস্নখিত অধিকাংশ নেতিবাচক দিক থেকে মুক্ত নয়।

তৃতীয়ত: মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের মাঝে অগ্নিযুদ্ধ ও সৃষ্ট ঘৃণা বোধ:

আমি হাদীস বিভাগের অনেক ছাত্র ভাইকে দেখেছি যে, তারা ইলমুল ফিক্বহ শিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে এবং পবিত্র সুনণাহকে দিরায়াত (উপলদ্ধি) ছাড়া শুধু রেওয়ায়াত (বর্ণনা) গত দিক থেকে গ্রহণ করতে ব্যসত্ম থাকে। আবার ফিক্বহ শাস্ত্রের অধিকাংশ ছাত্রকে দেখেছি যে, তারা হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন, তার সনদ পরিচিত ও মতন মুখস্থ করা থেকে বিরত থাকে। অথচ তারা মাযহাবী ফিক্বহী গ্রন্থ আয়ত্তকরণ ও সংক্ষপ্ত ফিক্বহী গ্রন্থগুলো মুখস্থ করার ক্ষেত্রে নিবেদিত থাকে। এ ঘৃণাবোধ অতীত থেকেই বিদ্যমান। যাকে উত্তেজিত করেছে কিছু সংখ্যক হাদীস সংকলক ও মুষ্টিমেয় ফক্বীহ। এটা মূলতঃ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়েছে। ফলে তারা একে অপরকে নিন্দা করে ও বাঁকা চোখে দেখে।

ইমাম খাত্ত্বাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৩৮৮ হিঃ) বলেন:[7]

‘‘আমাদের যামানায় বিদ্বানদের দেখা যায় যে, তারা দু’টি দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে:

১। হাদীস ও আসার এর অনুসারী। ২। ফিক্বহ ও যুক্তির (নাযর) অনুসারী।

তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে একটি অপরটির মুখাপেক্ষী। কেননা ভিত্তির দিকে লক্ষ্য করে হাদীস হচ্ছে আসল এবং স্থাপনার দিকে লক্ষ্য করে ফিক্বহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা। স্থাপনা যদি মূল ভিত্তির উপর না রাখা হয়, তাহলে সেটা অকার্যকর হবে এবং ভিত ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করলে সেটি অকেজো ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমি উভয় দলকে পেয়েছি নিকটতম প্রতিবেশী ও পাশাপাশি দু‘টি বাড়ীর মত। প্রত্যেকটি দল একে অপরের ব্যাপক প্রয়োজনে আসে। তাদের উভয়কেই তার সাথীর নিকট জরুরী ভিত্তিতে দরকার হয়। তারা যেন হিজরতকারী ভাইয়ের মত। কোন প্রকার প্রাধান্য ছাড়াই সঠিক পথে চলার জন্য একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যারা হাদীস ও আসারের অনুসারী তাদের অধিকাংশই রেওয়ায়াত বা বর্ণনার অনুরাগী, বিভিন্ন পদ্ধতি একত্রিতকারী, গরীব ও শা’য হাদীস অনুসন্ধানকারী, যার অধিকাংশই জাল অথবা মাকলুব বা পরিবর্তিত। তারা মতনের দিকে লক্ষ্য করে না, অর্থও বুঝে না এবং এর গোপন ভেদ ও গুঢ় রহস্যও উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং ফক্বীহদের সমালোচনা করে, তাদের বাঁকা চোখে দেখে এবং সুন্নাত বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা খুব সামান্য এবং এটাও বুঝে না যে, ফক্বীহদের গালি দেয়া পাপের কাজ।

অপরদিকে যারা ফিক্বহ ও যুক্তির (নাযর) এর অনুসারী তাদের অধিকাংশই স্বল্প হাদীস ছাড়া তেমন হাদীস বর্ণনা করে না। তারা সহীহ হাদীসকে যঈফ থেকে পৃথক করে না। উত্তম হাদীসকে নিমণমানের হাদীস থেকে আলাদা করে না। তাদের কাছে যে হাদীস পৌঁছে তা তাদের দাবীকৃত মাযহাবের অনুকূলে হয়ে গেলে এবং তাদের বিশ্বাসকৃত মাযহাবের মত অনুযায়ী হলে বিতর্কিত বিষয়ে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে আপত্তি করে না। কোন যঈফ ও মুনকাতি হাদীস যদি তাদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহলে সেই যঈফ ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে। এমন করে ক্রমাগতভাবে কোন নির্ভরযোগ্যতা ছাড়া ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়াই তাদের মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষত হয়। এর ফলে রাবীর বর্ণনা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটে এবং তাতে বিভ্রামিত্ম সৃষ্টি হয়।

মূলতঃ হাদীস ও ফিক্বহ শাস্ত্র হলো, অকৃত্রিম দু'ভাই স্বরূপ এবং পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে উভয়ে খুবই নিকটবর্তী। এ জন্য ইবনুল মাদানী (রাহি.) বলেন: ‘‘হাদীসের অর্থ নিয়ে গবেষণা করাটা অর্ধেক জ্ঞানার্জন করার সমান। আর রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে জানাও অর্ধেক জ্ঞানার্জনের সমান’’।[৪] সুতরাং হাদীস ও ফিক্বহ শাস্ত্র যেন একজন আলিমের জন্য একই পাখির দু’ডানা স্বরূপ।

শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:[৯] ‘‘ ফিক্বহ শাস্ত্র রচনাকারী যদিও ফিক্বহ শাস্ত্র ও ইলমুল উসূল সম্পর্কে সুদক্ষ হয় এবং সহায়ক সকল বিষয়ে পা--ত্য অর্জন করে এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। কিন্তু যদি তিনি হাদীস শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করেন, হাদীস শাস্ত্রে অদক্ষ হন, সহীহ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে না জেনে গ্রন্থ রচনা ও প্রণয়ন করেন তাহলে তার গ্রন্থটি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে। কেননা কিয়দংশ ছাড়া ফিক্বহ শাস্ত্রের সম্পূর্ণটাই হাদীস শাস্ত্র হতে গৃহীত। এ বিধানটি কুরআনুল কারীম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। সুতরাং যদি কেউ হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানী না হয়, সে ব্যাপারে যদি দক্ষ না হয় এবং গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে যদি হাদীস শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে তাহলে শাস্ত্রবিদগণ তাদের শাস্ত্র দিয়ে কি করবেন?!’’

এ জন্যই ফিক্বহের সুক্ষ্ম আর মাসআলার ক্ষেত্রে ন্যায়-পরায়ণ ও শক্তিশালী মাযহাব হলো- মুহাদ্দিসদের মাযহাব। কেননা তারা নবুওয়াতের ঝরণা থেকে পান করেছেন এবং রিসালাতের প্রদীপ থেকে আলো গ্রহণ করেছেন। এখানেই তারা আসা-যাওয়া করেছেন।[10]

‘‘সে ব্যক্তি কতই না মন্দ মুহাদ্দিস! যাকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা জানেন না। অথচ তিনি হাদীস সংকলন করার কাজে ব্যাস্ত থাকেন। আর সে ব্যক্তি কতই না মন্দ ফক্বীহ! যাকে বলা হয় রাসূল (ﷺ) এর এ বাণীর অর্থ কি? তখন তিনি তার অর্থ ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলতে পারেন না’’।[11]

সালাফদের ত্বরীকা ও রীতি-নীতি ছিল রেওয়ায়াতকে দেরায়াতের সাথে এবং দেরায়াতকে রেওয়ায়াতের সাথে মিলিয়ে নেয়া। আর এই রীতি গ্রহণের ব্যাপারেই তারা উপদেশ দিয়েছেন।

মাসআব আযযুবাইরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মালিক বিন আনাসকে বলতে শুনেছি, তিনি তার দুই ভাগ্নে তথা আবূ উয়াইস এর দুই ছেলে আবূ বকর ও ইসমাঈলকে বলেন: ‘‘আমি তোমাদের দু‘জনকে এ বিষয়টিকে ভালবাসতে ও অনুসন্ধান করতে দেখছি। তথা হাদীস শ্রবণ করতে দেখছি। তখন তারা দু‘জন বললেন, হাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। তখন মালিক বিন আনাস বললেন: যদি তোমরা হাদীস দ্বারা মানুষের উপকার করতে চাও এবং আল্লাহ্ও যদি তোমাদের দ্বারা উপকার করিয়ে নিতে চান, তাহলে হাদীস স্বল্প করে সংগ্রহ কর, কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানার্জন করার চেষ্টা কর’’।[12]

আমার কথা হল: সহীহ সুন্নাহ ও আসার হতে সুক্ষ্ম ফিক্বহ শাস্ত্র গ্রহণ করা আমাদের একামাত্র কর্তব্য যা বিদ্বানদের নীতিমালার আলোকে পূর্ববর্তী উম্মাহ ও ফক্বীহদের বোধগম্যতার মাধ্যমে প্রবহমান।

ফুটনোট

[1] শাইখ সুলাইমান আল আওদাহ (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) প্রণীত ‘যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিক্বহিয়্যাহ’ পৃ:৩৩-৩৮, সামান্য পরিবর্তন করে।

[2] ‘যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিক্বহিয়্যাহ’ পৃ: ৪৫।

[3] এ মাসআলার ব্যাপারে সতর্কবাণী শীঘ্রই আসবে।

[4] ‘যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিক্বহিয়্যাহ’ পৃ: ৪১,৪২ ।

[5] প্রাগুক্ত পৃ:৪২।

[6] প্রাগুক্ত পৃ:৪৭।

[7] ‘মা‘আলিমুস সুনান’ (১/৭৫)

[8] আল খত্বীব প্রণীত ‘আল জা‘মি লিআখলাক্বির রাবী ওয়াস সা‘মি’ (২/২১১) ।

[9] ‘আদাবুত ত্বলাব’ পৃ: ৪৫-৪৬ ।

[10] সালিহ আল উসাইমীন প্রণীত ‘তাযকিরাতুল হাদীসী ওয়াল মুতাফাক্বিহ’ পৃ:৬।

[11] ইবনুল যাওযী প্রণীত ‘সইদুল খতির’ পৃ: ৩৯৯-৪০০ ।

[12] রমাহ রমযী প্রণীত ‘আল-মুহাদ্দিসুল ফাযিল’ পৃ: ২৪১ ও আল-খতীব ‘নাসীহাতু আহলিল হাদীস’ (পৃ: ৩৭) যা- ‘তাযকিরাতুল হাদীসী ওয়াল মুতাফাক্বিহ’ (পৃ: ২৮) হতে গৃহীত হয়েছে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2193

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন